Vol. 35 | No. 3 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য || আবদুল হাকিম রচনাবলী

Volume	35
Issue	3
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	খন্দকার মুজাম্মিল হক
Published online	June 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v35i3.12
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i3.12
Pages	204-212
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

গ্রন্থ—পরিচয়

Check for updates

(ক) **ড: রাজিয়া সুলতানা।। আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য।** প্রকাশক : বাংলা একাডেমী বৈশাখ ১৩৯৪, মে, ১৯৮৭। পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৮+২২৭। মূল্য ৭৫ টাকা মাত্র।

(খ) **ড: রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত।। আবদুল হাকিম রচনাবলী।** প্রকাশক: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। জুলাই ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ৫৩৬, মূল্য ৫০০ টাকা।

আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য ড: রাজিয়া সুলতানা প্রণীত একটি গবেষণা গ্রন্থ। ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় পরবর্তী কালে, ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে, ড: রাজিয়া সুলতানারই সম্পাদিত *আবদুল হাকিম রচনাবলী* প্রকাশিত হয়। 'রচনাবলী' প্রকাশ করেন ঢকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই দুটি গ্রন্থ মিলিয়ে পাঠ করলে, যে আবদুল হাকিমকে আমরা পাই, তাঁর জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ছেড়ে দিতে হয়।

আবদুল হাকিম এতদিন সাধারণ্যে, চারটি বিশিষ্ট চরণের কবি হিসেবেই পরিচিত হয়ে আসছিলেন। বাংলা ভাষার চর্চা ও গুরুত্ব নির্দেশ করতে গিয়ে এই চারটি চরণ ব্যাপকভাবে উদ্ধৃত হয়ে থাকে :

> যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
> সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি
> দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না যুয়ায়
> নিজ দেশ ত্যাগি কেন্হে বিদেশে না যায়

এ ছাড়া, পণ্ডিত গবেষকের কাছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, অ হাকিমের পরিচয়ও ছিল অসম্পূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর। তার প্রধান কা তথ্যনিষ্ঠ গবেষণার অভাব। ড: রাজিয়া সুলতানা মধ্যযুগের সাহিতে সে অভাব পূরণ করলেন। তিনি আবদুল হাকিম সম্পর্কিত সকল সংশয়পূর্ণ মত এবং সিদ্ধান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পরীক্ষা করেন ও ব্যাপক অনুসন্ধানের মাধ্যমে, প্রা নতুন তথ্যের আলোকে, কবির অধিকতর পূর্ণাঙ্গ রূপ তুলে ধরেন।

আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য গ্রন্থটির কাঠামো নির্মিত হয়েছে 'প্রসঙ্গকথা,' সাতটি পরিচ্ছেদ, 'গন্থপঞ্জী' ও নির্ঘন্ট-সহ মোট দু'শ সাত পৃষ্ঠায়। প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনামা 'কবি পরিচিতি'। এ পর্যায়ে বর্ণিত হয়েছে (ক) ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি, (খ) কবির

নিবাস, (গ) কবির কালনির্ণয় সমস্যা, কবির জীবনকথা।

গবেষক বৃহত্তর নোয়াখালীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠনের চেষ্টায় বহু দুর্লভ তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে, সেসব তথ্যের আলোচনা-সমালোচনা ও গ্রহণ বর্জনে গ্রন্থটি যুগপৎ তথ্য-সমৃদ্ধ এবং সাবলীল হয়ে উঠেছে। গবেষক কবির নিবাস সম্পর্কে নতুন তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং নানান যুক্তি প্রমাণে পূর্ববর্তী গবেষকদের মতামতকে খণ্ডন করে, পরিত্যাজ্য করে তুলছেন। ড: মুহম্মদ এনামুল হক বলেছিলেন, কবি আবদুল হাকিমের বাসস্থান 'সন্দ্বীপের সুধারামে' (দ্র: *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*)। *দূররে মজলিশের* একটি অনুলিপিতে, কবির নতুন একটি ভণিতা গবেষক আবিষ্কার করেছেন :

আবদুল হাকিম হীন বাবুপুর ঘর
রচি পাঞ্চালী এহি অমৃত লহর ::

এ সম্পর্কে গবেষক বলেন "বাবুপুর বর্তমানে নোয়াখালী জেলার ফেনী ও বেগমগঞ্জের নিকটবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ... কিন্তু এককালে 'বাবুপুর' ভুলুয়া রাজ্যের অধীনে একটি সমৃদ্ধ পরগণা ছিল" (পৃ. ২১)। কবির কালনির্ণয় সমস্যা নিয়েও বিস্তর তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রমাণ যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করে গবেষক দেখিয়েছেন "কবি আবদুল হাকিম সতেরো শতকে (আনুমানিক ১৬০০-১৬৭০ খ্রী:) বর্তমান ছিলেন।"

বাহ্য প্রমাণ প্রসঙ্গে গবেষক, কয়েকটি পাণ্ডুলিপির লিপিকাল বিচার ক[illegible] এতে, সর্বনিম্ন লিপিকাল বা প্রাচীনতম লিপিকাল হচ্ছে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ। এর দ্বারা এটুকু প্রমাণিত হয় যে, কবি এর পরবর্তী নন, তবে, কতটা পূর্ববর্তী, তার জন্য অন্য তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। সদরগাজী 'শমশের গাজী' [illegible]াজ্যকাল : ১৭৩৭-৪৩ খ্রী:) প্রতিপালক, চম্পক রায় (১৬৯৫-১৭০৫ খ্রী:), [illegible]শাহ, (১৬৯৬-১৭০০ খ্রী: আনুমানিক) প্রভৃতি তথ্যের (বাহ্যিক প্রমাণ) [illegible]ক কবি আবদুল হাকিমের সময়কাল নিরূপণের চেষ্টা করেছেন।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সূত্রে গবেষক 'চন্দ্রাণী' নামটি বিশ্লেষণ করে, দৌলতকাজীর *লোর-চন্দ্রাণী* কাব্যের কাল বিবেচনা করে, হাকিমের সময়কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। কবির কাব্যে ব্যবহৃত কয়েকটি পর্তুগীজ শব্দ; যেমন (আনান্নাস); আতা', পাবিআ (পেঁপে) প্রভৃতি দৃষ্টে গবেষক বলেন— ষোড়শ শতকের শেষের দিক থেকে, ক্রমবর্ধমান পর্তুগীজ প্রভাবের কালে, এই শব্দগুলো বাংলায় ব্যবহৃত হতে থাকে। তবে, তখনো শব্দগুলো পরিবর্তনের স্তর অতিক্রম করেনি। সুতরাং, তাঁর অনুমান— *লালমোতি* কাব্যটি সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি

সময়ের রচনা। এ-প্রসঙ্গে আবদুর হাকিমের ভাষাপ্রীতির কথাও গবেষক বিবেচনা করেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম হচ্ছে 'কাব্য-পরিচিতি; ইউসুফ জোলেখা'। গবেষকের মৌলিকতার স্বাক্ষর এ-অংশেও উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। তিনি দেখিয়েছেন আবদুল হাকিম মূলতঃ মোল্লা জামীর ফার্সী *ইউসুফ ওয়া জুলায়খা* গ্রন্থকে অনুসরণ করলেও ক্ষেত্রবিশেষে যেমন স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন, তেমনি, মাঝে মধ্যে পূর্বসুরী কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের *ইউসুফ জোলেখা* গ্রন্থকেও অনুসরণ করেছেন। এই অনুসৃতি কোথায়, কিভাবে কতটুকু ঘটেছে, তা উদ্ধৃতি-সহ বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়,— *লালমোতি সয়ফুল মূলক কাব্য* । এতে কাব্যের উৎস বিচার, কাহিনী-বিশ্লেষণ ও সে-সঙ্গে সমসাময়িক ও পূর্ববর্তী প্রণয়োপাখ্যান গ্রন্থের সঙ্গে উপাদানগত সাদৃশ্য বিবেচনার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপর এসেছে লালমোতি কাব্যধারার পরবর্তী কবি শরীফ শাহের কাব্যের সঙ্গে একটি প্রতিতুলনা। তা থেকে যে সিদ্ধান্ত উৎসারিত হয়েছে তা রচয়িত্রীর নিজের ভাষাতেই উল্লেখ করা যায় : "আবদুল হাকিমের কাব্য যেখানে ব্যঞ্জনাময় ও জীবন-নিষ্ঠ, শরীফশাহের কাব্য সেখানে বিবৃতিধর্মী সাধারণ কাহিনী মাত্র"। গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে *দূররেমজলিশ* বা *দুল্লামজলিশ* কাব্যের পরিচিতি। এখানে গবেষক ফারসী *দূররে মজলিশ* রচয়িতা সাইফ আল্ জাফর নওবাহারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে আবদুল হাকিমের *দূররে মজলিশ* গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে, আঠারো শতকের অপর কবি আবদুল করিম খোন্দকারের *দূররেমজলিশ* কাব্যের সঙ্গেও হাকিমের কাব্যের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের পরিচিতি দেয়া হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে গবেষকের সিদ্ধান্তমূলক বক্তব্য হচ্ছে : 'ডক্টর আহমদ শরীফ কেফায়াতুল মুসল্লীনের রচয়িতা মুত্তালিব সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি কবি নন, শাস্ত্রকার। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি, 'দূররে মজলিশ' রচয়িতা আবদুল হাকিম শুধু শাস্ত্রকার নন, কবিও।' *আবদুল হাকিম কবি ও কাব্য* গ্রন্থের পঞ্চম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে *নূরনামা* পরিচিতি। এতে *নূরনামা* কাব্যের উৎস বিষয়ে কুরআনশরীফ-এর সুরাহ্ 'নূর', আহ্যাব', 'সফ', 'তাগাবুন' এর আয়াত বিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে। পরে কি ভাবে এই 'নূরতত্ত্ব' অধ্যাত্মচিন্তা ও মরমীবাদের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে মুসলিম বিশ্বে এক বিশেষ শাস্ত্রীয় বিষয়ে পরিণত হলো, তার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস তুলে ধরেছেন ড: রাজিয়া সুলতানা।

এ-প্রসঙ্গে বাঙলায় আর যাঁরা *নূরনামা* কাব্য প্রণয়ন করেছেন, তাঁদের

সম্পর্কেও গবেষক আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে গবেষক প্রচলিত সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। যেমন : "শেখ পরানের জীবৎকাল আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ।" ইচ্ছে করলে এখানে গবেষক বিবেচনা করে দেখতে পারতেন, আঠারো শতকের কবি 'মুহম্মদ মুকিম' (মৃত্যু; ১৭৮০ খ্রী:) শেখ পরানকে কেন সমসাময়িক বৃদ্ধ কবি বলে উল্লেখ করে ছিলেন (পুঁথি পরিচিতি – পৃ. ১০১)। তবু বলা যায় এ-পরিচ্ছেদকেও গবেষক বহু নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ করেছেন, বিভিন্ন *নূরনামা* 'র পাঠোদ্ধার করে, তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে কবির উৎকর্ষ বিচার করেছেন। এ-শ্রেণীর কাব্যে কবিত্ব প্রকাশের অবকাশ কম। নীতিকথা এবং ধর্মীয় কাব্য বলে, এতে হাকিমের পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধ্যের পরিচয় অনুপস্থিত। তবে ভাষাপ্রীতির তীব্র ও জ্বালাময় উচ্চারণ একাব্যেই সবচেয়ে জোরালোভাবে ধ্বনিত হয়েছিল। কবির কাব্যে বিধৃত সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে। এ-অধ্যায়টি সমাজ-ইতিহাসের তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ। শুধু কাব্যের উদ্ধৃতি নয়, নানান সহযোগী ও সমধর্মী তথ্য প্রমাণ, তার আলোচনা ও বিশ্লেষণে এ-অধ্যায়টি মুঘল শাসনামলের জীবন ও সমাজ বৈশিষ্ট্য উপস্থাপনের জন্য কৌতূহলপ্রদ হয়ে উঠেছে। সাবলীল বর্ণনা-ভঙ্গী রচনাংশটি কে সুখপাঠ্য করেছে। এ-পর্যায়ে রাজকীয় পরিবেশ, জীবন ও জীবিকা, পারিবারিক জীবন, পোশাক, অলঙ্কার ও প্রসাধন, বিবাহ, আচার-ব্যবহার ও লোকসংস্কার, শিক্ষা সংস্কৃতি প্রভৃতি আলোচিত। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে বলতে গিয়ে গবেষক সে-যুগের অনেক সৎ ও মহৎ আদর্শের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। একস্থলে বলেছেন, "পুত্রবধূর মর্যাদা কন্যার তুলনায় অধিক ছিল।" আবদুল হাকিমের রচনা থেকে এর উদাহরণ দিয়েছেন গবেষক। যেমন –

১ সহস্র দুহিতা নহে বধূর সমান।

২ পরের ঘরের দীপ দুহিতা সকল।

৩ দুধেতে শক্কর (শর্করা) যেন পুত্ত সঙ্গে বধূ।।
উপজিলে পৌত্র যেন তাতে পড়ে মধু।।
(লালমোতি সয়ফুলমুলুক)

সুতরাং, সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে কবি মুকুন্দরাম যে *চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে'র* নায়িকা ফুল্লরাকে কাঁদতে দেখে নায়ক কালকেতুকে দিয়ে বলিয়েছিলেন—

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ কইলি চক্ষু কইলি রাতা।

সে অবস্থা পরিবার বিশেষেরই অবস্থা। শাশুড়ী-বধূ একত্র হওয়া মানেই যে আদায়-কাঁচকলা সম্পর্ক হওয়া— এরূপ ধারণা থেকে আবদুল হাকিমের কাব্য আমাদের উদ্ধার করেছে। একালের লাল গালিচা সংবধনার রীতি সম্ভবতঃ মুসলমান সভ্যতারই দান। গবেষক আবদুল হাকিমের কাব্যে 'লাল গালিচা সম্বর্ধনার' অনুরূপ অনুষঙ্গ খুঁজে পেয়েছেন—

আতলস আদি বস্ত্র প্রভৃতি সকল
মনরঙ্গে বিছায় ইউসুফ পদতল
দেখিতে সেসব বস্ত্র অতি অপরূপ"
(ইউসুফ জলিখা)

সপ্তম পরিচ্ছেদে 'আবদুল হাকিমের কবিকৃতি' বর্ণিত। আবদুল হাকিমের উপমা-অলঙ্কার প্রয়োগের বিশিষ্টতা, ভাষাগত উৎকর্ষ, শব্দ-তৈরির কৃতিত্ব, জ্ঞান-গর্ভ প্রাবাদিক চরণ নির্মাণের নৈপুণ্য এ-অংশে বিশ্লেষিত হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ভারতচন্দ্রের পূর্বে আলাওলের মতো আবদুল হাকিমও সারগর্ভ প্রবাদ-প্রবচন ও প্রৌঢ়োক্তি রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। *আবদুল হাকিম রচনাবলী* থেকে গবেষক এর বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দুএকটি উল্লেখ করা যায়:

১. পশু হস্তে মন্দ অতি জ্ঞানহীনজন
চোঙ্গাতে কুকুর পুচ্ছ বঙ্গানা ছাড়এ
(অর্থাৎ কুকুরের লেজ চোঙ্গার ভিতর ভরে রাখলেও বক্রতা সারেনা।) (দু. ম.)
২. অভাগ্য জনের ডিঙ্গা ডুবি যায় তীরে
ভাগ্য হীন জন মুণ্ডে বৃক্ষ ভাঙ্গি পড়ে (ই. জ.)
৩. পণ্ডিত জনের শত্রু নাহিক ভুবনে (লা. স.)
৪. বিনি পরীক্ষায় কভু শুদ্ধ নহে মন (লা. স.)
৫. চিন্তায় মনের শ্রদ্ধা (আকাঙ্ক্ষা) কভু না পুরএ
চিন্তায় বাড়এ ভয় তনুমাত্র ক্ষয় (দ. ম.) ইত্যাদি

এ-সব প্রবাদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় কিংবা অঞ্চল বিশেষের প্রভাব কতখানি আছে তাও গবেষক পরীক্ষা করেছেন। আবার, আবদুল হাকিম যে-সব পৌরাণিক উপকরণ ব্যবহার করেছেন, গবেষক তারও তালিকা প্রদান করেছেন। সবশেষে, আবদুল হাকিমের উদারনৈতিক, অসাম্প্রদায়িক, নীতিনিষ্ঠ, গার্হস্থ্য, ইহবাদী চিন্তাময় জীবনদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত দান করে তাঁকে আমাদের কাছের মানুষ রূপে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

কবিকৃতি প্রসঙ্গে গবেষক আর একটি বিষয় আলোচনা করতে পারতেন। সেটি হচ্ছে, আবদুল হাকিমের কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দো-বৈচিত্র্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি আবদুল হাকিম মাত্র পাঁচ প্রকার ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। মধ্যযুগের কাহিনীকাব্যগুলি যেহেতু গ্রাম-দহলিজ ও মজলিশে গীত হতো, তাই এক্ষেত্রে ছন্দে মাত্রাসমতার কিছু অভাব থাকলেও তা সুরের বৈচিত্র্যেই সম্পূরিত হতো। সে জন্য কবিতায় প্রায় প্রায়ই রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থাকতো। তবে হাকিমের কাব্যে যত রাগরাগিনীর উল্লেখ পাই মধ্যযুগের আর কারো কাব্যে ততটা পরিলক্ষিত হয় না। যেমন :

(ক) হাকিম চৌদ্দমাত্রার পয়ারকে রাগ 'আশাবরী', 'গান্ধারী', 'সহেলা', 'মালসী', 'যমক', 'ধানেশ্রী', 'পট মঞ্জরী' প্রভৃতি সুরে গেয় বলে উল্লেখ করেছেন।

(খ) তিনি সংস্কৃত 'দিগক্ষরা' (১০ আক্ষরিক) ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। একে কবি 'খর্বছন্দ' বলেছেন এবং এটি রাগগুজরীতে পাঠ্য বলে চিহ্নিত করেছেন। এ-ছন্দেরউদাহরণ—

স্বপ্নে মোক দিল দরশন।
দেখি হৈল পুলকিত মন

(গ) হাকিম ৬+৬+৮ মাত্রার ত্রিপদী ছন্দকে পরিতাল ছন্দ বা চন্দ্রাবলী ছন্দ বলেছেন। এর রাগ'হচ্ছে' দক্ষিণাবসন্ত'

(ঘ) ৮+৮+১০ মাত্রার ত্রিপদীকে দীর্ঘছন্দ বলেছেন। এর নামও 'দীর্ঘছন্দ'। যেমন—

'দেখিলে কন্যার হাসি মধু মনে লজ্জাবাসি
ভাঙ্গে পুনি কর এ প্রবেশ।
রূপের প্রশংসা অতি মিশিরে প্রতিনিতি
সর্বলোক প্রশংসে বিশেষ' (ই. জ.)

মধ্যযুগের সাহিত্য যেহেতু সুরসহযোগে পঠিত হতো, তাই কোনও চরণে দু'এক মাত্রা কম পড়লে তা সুর দিয়েই পূরণ করা হতো। 'মিশিরে প্রতিনিতি' সাত মাত্রা হলেও সুর দ্বারা টেনে এটিকে আট মাত্রা রূপেই আবৃত্তি করা হতো।

(ঙ) কবি আবদুল হাকিম আট মাত্রার ছন্দকে 'একাবলী' ছন্দ বলে উল্লেখ করেছে। এর রাগের নাম 'একতালি'। একাবলী ছন্দ মূলতঃ এগারো মাত্রার হয়ে থাকে। তবে মধ্যযুগে আট/নয় মাত্রার ছন্দকেও একাবলী ছন্দ বলা হয়েছে। আবদুল হাকিমের কাব্যে এর উদাহরণ :

না দেখিয়া লাল মোতি।
শোকে কান্দে নরপতি।। (লা. স.)

২.

ড: রাজিয়া সুলতানার *আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য* শীর্ষক অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অংশ *আবদুল হাকিম রচনাবলী* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৮৯ সনে প্রকাশিত হয়। এতে কবির চারটি গ্রন্থের সম্পাদিত পাঠ উপস্থাপিত হয়েছে. কাব্য চারটি হচ্ছে : *ইউসুফ-জলিখা* , *লালমোতি সয়ফুলমূলুক*, *দূররে মজলিশ* ও *নূরনামা* । কাব্যগুলো সম্পাদনায় সম্পাদক সমন্বিত পাঠ (Compsite text) পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন: কবির এযাবৎ প্রাপ্ত সবগুলো পাণ্ডুলিপিই গবেষক পরীক্ষা করে গ্রহণযোগ্য পাঠ নির্ণয় করেছেন: *ইউসুফ-জলিখার* পাঁচটি, *লালমোতি সয়ফুলমূলুক* এর দশটি, *দূররে মজলিশ* -এর পনেরোটি ও *নূরনামা-র* পাঁচটি পাণ্ডুলিপি এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত এবং সবগুলোই গবেষক কর্তৃক পরীক্ষিত। সেদিক থেকে তাঁর পাঠ নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত হয়েছে। এ-ছাড়া দুষ্পাঠ্য ও প্রয়োজনের অধিক পাঠ থেকে গৃহীত পাঠান্তরের উল্লেখ করায় পাঠকের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি প্রয়োগেরও সৃষ্টি হয়েছে। এ-গ্রন্থে গবেষক আবদুল হাকিমসংক্রান্ত যাবতীয় বিভ্রান্তিগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। ড: রাজিয়া তাঁর *আবদুল হাকিম : কবি ও কাব্য* গ্রন্থের বিবেচনাগুলো স্বল্পাক্ষরে পুনরুল্লেখ করেছেন। ভাবী কালের পাঠক-গবেষকের জন্য তা' গবেষণার পথকে সুগম ও ত্বরান্বিত করবে।

আবদুল হাকিমের *ইউসুফ জলিখা* *বাইবেল* ও *কুরআন শরীফ* উক্ত কাহিনী কাঠামোরই পল্লবিত রূপ। মোল্লা জামীর (মৃঃ ১৪৯২ খ্রী:) ফারসী *ইউসুফ জুলায়খা* কবি হাকিম অনুসরণ করেছেন বলে কবি নিজে কাব্যের সূচনায় জানিয়েছেন। কাব্যটি বাংলা রোমান্টিক প্রণোয়পাখ্যান ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। *লালমোতি সয়ফুলমূলুক* কাব্যের কাহিনী প্রধানত শাহ সিকান্দার পুত্র সয়ফুলমুলুক-এর প্রণয়কাহিনী। নায়ক সয়ফুলমূলুক জনৈক পর্যটকের মুখে লালমোতির রূপের প্রশংসা শুনে তার প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়। পথে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, ছয়টি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সে লালমোতিকে লাভ করে। এই দুঃসাহসী অভিযানকালে রাকবানু নামে এক রাজকন্যার সঙ্গে পরিচয় হয়। এবং তার সঙ্গে সয়ফুলমুলুকের পরিণয় ঘটে। পরে সে লালমোতির সন্ধানে বহু দুর্ভোগের পর অবশেষে দুই বধূ নিয়ে পিতা-মাতার কাছে ফিরে যায়। কাব্যটি প্রণয়য়োপাখ্যান হলেও ঘটনার চেয়ে জীবননিষ্ঠাই এর মুখ্য আকর্ষণ। বিভিন্ন চরিত্রের আচার-আচরণে দাম্পত্য প্রণয়, গৃহগত সৌজন্য ও সামাজিকতা বিশদ ভাবে প্রস্ফুট হয়েছে।

কবি আবদুল হাকিমের *দূররে মজলিশ* একটি সুখপাঠ্য ও বহুলপ্রচলিত

নীতিকাব্য। এতে চৌত্রিশটি অধ্যায় রয়েছে। হযরত মুহম্মদ (দঃ) সহ বিভিন্ন পয়গম্বর, খলিফা, সাধক এবং মনীষীর হিতোপদেশ পূর্ণ ঘটনার সমাবেশ ঘটেছে। এ-গ্রন্থে অন্যান্য প্রাচীন নীতিশাস্ত্রের সঙ্গে এর প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এর পরিবেশন-রীতি বা কাব্যশৈলীতে। সংস্কারমুক্ত নতুন মূল্যবোধে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করাই এখানে কবির অন্যতম লক্ষ্য। *নুরনামা* আবদুল হাকিমের সৃষ্টিতত্ত্ববিষয়ক একটি ক্ষুদ্র কাব্য। এ-কাব্যে মাতৃভাষাচর্চার সপক্ষে কবি অসাধারণ জোড়ালো ও জ্বালাময় বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার *নুরনামা* ধারায় মধ্যযুগে আরও অনেকে কাব্য-রচনা করেছেন। এরা হচ্ছেন শেখ পরাণ, মীর মুহম্মদ সফি, আবদুল আলী, দেবান আলী, মুহম্মদ খাতের প্রমুখ।

আবদুল হাকিম *হানিফার লড়াই* নামে একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। এর তিনটি খণ্ডিত অনুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। সুতরাং এটিকে গবেষক রচনাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। *চার মোকাম ভেদ*-কেও কেউ কেউ হাকিমের রচনা বলে উল্লেখ করে থাকেন। কিন্তু এতে আবদুল হাকিমের কোন ভণিতা নেই। কবির *দূররে মজলিশ* কাব্যের একটি অনুলিপির সঙ্গে এটি বাঁধাই করা ছিল বলে একে হাকিমের রচনা বলে চালাবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। *আবদুল হাকিম রচনাবলী*-তে গবেষকপ্রাপ্ত সবগুলো পাণ্ডুলিপির বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। এবং প্রাচীনতা অনুসারে এগুলোকে বিন্যস্ত করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থের দুর্লভ সংযোজন হচ্ছে, প্রক্ষিপ্ত-পাঠ অধ্যায়টি। যে-কোন পাণ্ডুলিপির সম্পাদনাক্ষেত্রে প্রক্ষিপ্ত পাঠ অপরিহার্য। গবেষক গ্রন্থের পরিশিষ্টে *ইউসুফ জলিখা* কাব্যের প্রক্ষেপসমূহ উল্লেখ করেছেন। এ-প্রক্ষিপ্ত অংশ সগীরের *ইউসুফজোলেখা* কাব্যের অংশ মাত্র। তবে এতেও নানান তথ্যগত অসঙ্গতি ও পাঠগত বিকৃতি আছে— যা থেকে নিশ্চিতভাবেই গবেষক প্রক্ষিপ্ত পাঠের সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। *লালমোতি* এবং *নুরনামা* কাব্যের কিছু প্রক্ষিপ্ত পাঠ পরিশিষ্টে উল্লেখিত হয়েছে।

সম্পাদিত *আবদুল হাকিম রচনাবলী*-তে গবেষক শব্দার্থ ও টীকা প্রদান করেছেন। এই অংশের বিশিষ্টতা এই যে, এতে ব্যুৎপত্তিসহ শব্দের প্রয়োগও সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হয়েছে। এবং বিভিন্ন কাব্য থেকে তুলনাও সংগ্রহ করা হয়েছে। শব্দের উদাহরণের সঙ্গে তৃতীয় বন্ধনীতে সংশ্লিষ্ট কাব্যের যথাক্রমে পর্বসংখ্যা ও চরণসংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে। এতে গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বহুবিধ প্রয়োজন পূরণ হবে।

বস্তুতঃ আমরা দেখতে পাচ্ছি, ড: রাজিয়া সুলতানা আবদুল হাকিমকে পূর্ণাঙ্গরূপে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। এ-কাজটি অত্যন্ত দুরূহ এবং

আয়াসসাধ্য। এরূপ একটি শ্রমসাধ্য কাজ করে তিনি আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন মধ্যযুগের সাহিত্যকে যাঁরা এক নিঃশ্বাসে পাঠ করতে চান আবদুল হাকিমের জন্য তাঁদের নিঃশ্বাসকে আরও দীর্ঘ করতে হবে। ড: রাজিয়া সুলতানা প্রমাণ করলেন মধ্যযুগের সাহিত্য এত সীমাবদ্ধ নয়, এত বৈচিত্র্যহীন নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমীর পাণ্ডুলিপির শাখায় সংরক্ষিত লক্ষাধিক পাণ্ডুলিপি পর্যায়ক্রমে সম্পাদিত হতে থাকলে সে বিশ্বাস আরও দৃঢ়ীভূত হবে।

খন্দকার মুজাম্মিল হ